সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৮ ॥ সংখ্যা : ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪২৯ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

# মধু সাধুখাঁ : জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে

সোহানা মাহবুব*

**সারসংক্ষেপ:** অমিয়ভূষণ মজুমদারের *মধু সাধুখাঁ* (প্রপ্র. ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, গ্রপ্র. ১৯৮৮) উপন্যাসে বণিক মধুর যে আভিযাত্রিক জীবন রূপায়িত হয়েছে, সেখানে জীবন-মৃত্যুর দোলাচল প্রতিধ্বনিত। উপন্যাসে মধু প্রবলভাবে জীবনবাদী হলেও সেই প্রাবল্যে মৃত্যুর ঘ্রাণ জড়িয়ে আছে। মধুর পূর্বসূরিদের জীবনেতিহাসে স্বল্পায়ুর আধিক্য তার ভেতর জন্ম দিয়েছে এমন এক দর্শনের, যে দর্শন থেকে সে উপলব্ধি করেছে, কোনোভাবেই 'পুরুষ জীয়ে না।' পুরুষের জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাকে বাঁচতে দেয় না। মধুও তেমনই এক পুরুষ, যার অনিশ্চিত বণিকজীবন জুড়ে টিকে থাকার লড়াই আর মৃত্যুর অনিশ্চয়তা ছায়া ফেলে। মধুর চেতনায় বর্তমান আর অতীত জুড়ে খেলা করা মৃত্যুর মিছিল ফ্রয়েড কথিত জীবন-এষণা আর মৃত্যুর অনিশ্চয়তার মতো আপাত বিপরীত অনুষঙ্গ চিহ্নিত করে দেয়। উপন্যাসে মধু আর ফিরিঙ্গি রালফ্ ফিচ্ দুই ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন দেশের মানুষ হয়েও তাদের ভেতর বেঁচে থাকার প্রবল তৃষ্ণা আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফুরিয়ে যাবার গাঢ় ভয় মানবপ্রবৃত্তির সর্বজনীন ভাবনা হিসেবে উপন্যাসে অভিন্নতা লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধ *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে রূপায়িত মধুর প্রবল জীবন-এষণার পাশাপাশি তার জীবনের অনিশ্চয়তা এবং ভীষণ মৃত্যু-অনুষঙ্গের রূপচিত্র বিশ্লেষণে সচেষ্ট।

অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রবলভাবে একজন জীবনবাদী ঔপন্যাসিক। তাঁর কন্যা এণাক্ষী মজুমদার (২০১৭: ৪৩২) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "জীবন ভালোবাসতেন বাবা। বেঁচে থাকাটাই, তাঁর ভাষায় ছিল 'ইমপরট্যান্ট' – সব মালিন্য, দীনতা, কুশ্রীতা, তিক্ততা সত্ত্বেও। সব টানাপোড়েন, নিরন্তর দ্বন্দ্বময় দিনরাত্রি জীবনকে এত আকর্ষণীয় করে, বলতেন বাবা।" সাতাত্তর বছর বয়সে এক সাক্ষাৎকারে মৃত্যুভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি (অমিয়ভূষণ, ১৯৯৫) মন্তব্য করেছেন, 'মৃত্যুভাবনা কেন? যা অনিবার্য, তা অনিবার্যই।... রাত তো দিনের শেষে আসবেই।'

মৃত্যুকে খুব সাধারণভাবে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই সাধারণভাব তাঁর প্রবল জীবন কাঙ্ক্ষাকেই চিহ্নিত করে। *গড় শ্রীখণ্ড* (১৩৬৩) কিংবা *চাঁদবেনে* (১৯৯৩) উপন্যাসের ভেতর আমরা তাঁর সেই প্রবল জীবনবাদী কণ্ঠ শুনে থাকি। *গড় শ্রীখণ্ড* উপন্যাসে ছোটখাটো জিনিস দিয়ে জীবনের চিরস্থায়ী আয়োজনে যেমন এর চরিত্রগুলো কালকে অতিক্রম করে গেছে, তেমনি *চাঁদবেনে* উপন্যাসের চাঁদ – যার জীবনদর্শন,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.4

'মৃত্যু বলে কিছু নেই।... জীবন, শেষ অনুপল পর্যন্ত জীবন' – মৃত্যুকে গভীরভাবে অস্বীকার করেছে। অমিয়ভূষণের অধিকাংশ উপন্যাসের ভেতরই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার দুর্মর লড়াই, অর্থাৎ জীবন টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম-চিত্র মুদ্রিত। এরকম একজন লেখক যখন *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাস রচনা করেন, যেখানে জীবন টিকিয়ে রাখবার প্রবল সংগ্রামের চিত্রকল্প উদ্ভাসিত হয়ে আছে পাতায় পাতায়, কিন্তু সেই জীবন বড় বেশি মৃত্যুর কাছাকাছি – তখন কিছুটা বিস্মিত হতে হয়। ক্ষুদ্র কলেবরের উপন্যাসটিতে জীবনের পাশাপাশি মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটেছে গাঢ়ভাবে। সে মৃত্যু বিচিত্র রূপ নিয়ে উঠে আসে উপন্যাসে। বর্তমান প্রবন্ধ *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের জীবন ও মৃত্যুর আপাত বিপরীত ভাবনার সহাবস্থান, মৃত্যুদৃশ্যের মুখোমুখি ব্যক্তির অনিশ্চিত জীবনভাবনার বেদনা, মানবপ্রবৃত্তির সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা এবং উত্তরসূরির ভেতর বেঁচে থাকবার তীব্র ইচ্ছা বিশ্লেষণে সচেষ্ট।

*মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে মধু সাধুখাঁর আপাত মৃত্যুভীতির মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ তার প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আপাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও জীবন-এষণা ও মৃত্যুর অনিশ্চয়তা – এ দুটো বিষয় যে একে অপরের পরিপূরক, এ উপন্যাস পাঠ করবার পর সেটি পাঠকের চেতনায় মুদ্রিত হয়ে যায় । মধুর জীবন-এষণা প্রসঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রয়েডের একটি তত্ত্ব। ১৯২০ সালে প্রকাশিত *বিয়ন্ড দ্য প্লেজার প্রিন্সিপল* গ্রন্থে ফ্রয়েড মানুষের মরণ-প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মেলে তাঁর *দ্য ইগো এবং দ্য ইদ* নামক গ্রন্থে। ১৯৩২ সালে ফ্রয়েড এবং আইনস্টাইনের এক পত্রালাপেও কাম ও মরণ-প্রবৃত্তির কথা উঠে আসে। ফ্রয়েড মনে করেন, মানুষের ভেতর দুই ধরনের প্রবৃত্তি আছে, যার একটি জীবন-এষণা বা এরস, যাকে বৃহত্তর অর্থে প্লেটোনিক প্রেম বা সংকীর্ণ অর্থে যৌনতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। অন্যটি হলো মানুষের ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি, যাকে ফ্রয়েড বলেছেন থ্যানাটস বা মানুষের আগ্রাসী মনোভাব এবং এ মনোভাবজনিত ধ্বংস ও হত্যাজনিত ক্রিয়া। ফ্রয়েড মনে করেন, প্রতিটি প্রাণের ভেতর জীবন ও মরণ এষণা রয়েছে। প্রতিটি প্রাণ যখন আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিযুক্ত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রকাশ করে, তখন তাকে জীবন-এষণার প্রকাশ বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, যখন প্রাণীর ভেতর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তাকে মরণ-এষণা বলা যায়। তবে, এ দুটো প্রবৃত্তি একে অপরের সাথে যুক্ত। এ প্রসঙ্গে অমিতা চ্যাটার্জীর (২০১৪: ৩৩৮-৩৯) ভাষ্য উদ্ধৃত করছি:

> ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির সঙ্গে সব সময়ই জীবন-প্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে থাকে।... ফ্রয়েডের কাছে এই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি মরণ এষণা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মতে সব প্রাণীর মধ্যেই এই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি নিহিত আছে যা প্রাণকে তার আদিম উৎস অপ্রাণ বা জড় অবস্থার দিকে ক্রমাগত আকর্ষণ করে ও প্রাণকে জড়তে পর্যবসিত করার চেষ্টা করে। এই কারণেই ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তিকে বলেন মরণ-এষণা।... মানুষের মধ্যেই নিজেকে ধ্বংস করার ও অপরকে হনন করার প্রবণতা রয়েছে।... জীবনের প্রতি টান ও মরণের প্রতি টান এই

দুই এর মধ্যে কোনটি বেশি শক্তিশালী, কেনই বা মানুষের মধ্যে এই দুই টান এত বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয় – এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই ফ্রয়েড তাঁর দুটি প্রবৃত্তির তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন।... আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিলোপ, অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি এই দুই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলে – একে অপরের হাত ধরে।... মানুষের মধ্যেও আছে জীবন-এষণা ও জীবন-বিমুখ মরণ-এষণা। মরণ-এষণা যতক্ষণ প্রাণীর ভেতরে নিহিত থাকে ততক্ষণ আমরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারেই সচেতন থাকি না। মরণ-এষণা যখন ধ্বংস প্রবৃত্তিরূপে বহির্বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তখনই আমরা এ-বিষয়ে অবহিত হই। একটি প্রাণ তার নিজের প্রাণ রক্ষা করে বাইরের অপর একটি প্রাণ ধ্বংস করে।

*মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে ফ্রয়েড-কথিত মানুষের জীবন-এষণা প্রবলভাবে উপলব্ধ হবে। মধু বা উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলোর ভেতর প্রবল জীবন-এষণার পাশপাশি লেখক উপন্যাসে মৃত্যুর বিচিত্র প্রকাশকেও যুক্ত করেছেন। ফ্রয়েড-কথিত 'থ্যানাটস' এবং 'এরস'কে এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'নদী, জল, রক্ত, পাটাতন!' – এই চারটি শব্দের ভেতর বাণিজ্য জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস *মধু সাধুখাঁর* মূল প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। নৌবণিক মধু তার জীবনকে তুমুলভাবে যাপন করেছে। যদিও তার জীবন জলের মতোই অনিশ্চিত, টলোমলো। তাই, মৃত্যুভয় তার পিছু ছাড়ে না। জীবন ও মৃত্যুর প্রবল টানাপড়েনে মধুর জীবন নদীর মতোই বহমান। উপন্যাসে লেখক মধুর বর্ণাঢ্য জীবন বর্ণনা করতে করতেই মৃত্যুর পেলব রঙে অনিশ্চয়তার রেখা আঁকেন। তার অনিশ্চিত জীবন ও মৃত্যুভীতির পেছনে কাজ করেছে তার পূর্বসূরিদের স্বল্প আয়ুর জীবন। স্মৃতির মধ্য দিয়ে ফিরে ফিরে আসা পূর্বসূরিদের এসব মৃত্যু মধুকে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করে।

উপন্যাসের শুরুতেই প্রথম যে মৃত্যুস্মৃতি মধুর বাহুতে জ্বলজ্বল করে, সেটি তার কাকার পুত্রের মৃত্যু। মধুর তলোয়ারের চোপে ঘাড় থেকে মাথা নেমে গিয়েছিল সেই তরুণের। মধুর হাতে তার নিজ কাকার পুত্রের এই হত্যা ও রক্তপাত ছিল নারীকেন্দ্রিক। সেই নারীকে কুক্ষিগত করবার তুমুল আকাঙ্ক্ষা মধুকে দিয়ে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করায়। প্রসঙ্গটি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে:

> মদু সা-র নিজের বাঁ পুরোবাহুর ভিতর দিকে এক বিঘৎ লম্বা তিন-চার আঙুল চওড়া ক্ষতচিহ্ন আছে। তরোয়ালের চোপ।... দৃশ্যটা মনে ফিরে এসেছিল মদুর; শত হলেও নিজের কাকার ছেলে। একত্র মানুষ হওয়ার, ভালোবাসার স্মৃতি ছিল। ঘাড়টাই দো ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। কী রক্ত, আর কী শূন্যতা! তাকে আর জোড়া দেওয়া যায় না। হাতে একটি দাগ পড়েছে বৈ তো নয়, কী হতো তুমি যদি শির না মারতে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ১৯)

মধু কর্তৃক সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তার তীব্র জীবন-এষণা এবং ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। এ জীবন-এষণা ফ্রয়েড-কথিত 'প্লেজার প্রিন্সিপল' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মধুর এ

হত্যাকাণ্ডের পেছনে কাজ করেছে তার প্রবৃত্তিগত তাড়না। ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী, এটা একই সাথে জীবন কিংবা মরণ-এষণা:

> এগুলো অদস্-নিষ্ঠ অন্ধ যান্ত্রিক শক্তি, তাদের বিচারবোধ থাকে না। প্রবৃত্তি স্বভাবতই নির্বিচারে তৃপ্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। তাতে যদি প্রাণীর ক্ষতিও হয়, তাহলেও তারা নিবৃত্ত হয় না।... বহির্জগৎ থেকে যদি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে কোন বাধা আসে তাহলে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ না পেয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে টেনশন বা তানের সৃষ্টি হয় যেটি জীবের পক্ষে বেদনাদায়ক বা অ-সুখকর। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী অ-সুখ আসে তানের পরিমাণ বাড়লে আর তানের পরিমাণ কমে উত্তেজনা স্তিমিত হ'লে আসে সুখ। (অমিতা, ২০১৮: ৩৩৭)

পূর্বস্থলনিবাসী, জাতে কায়েত মধু সাধুখাঁর প্রবৃত্তি-প্রকাশে প্রতিবন্ধকতার ফল এ হত্যাকাণ্ড। মধুর পারিবারিক পরিমণ্ডলেই মৃত্যুর সহজ ইতিহাস মুদ্রিত। তাঁর পিতার তিন পক্ষের দুই পক্ষ বর্তমান হলেও মধু কর্তৃক ছোট মা বলে সম্বোধিত পিতার স্ত্রী চিতারোহণ করেন। মধুর পঁচিশ বছর বয়সী বণিক খুড়ো ভাদ্রের এক ভরাডুবিতে তলিয়ে যান প্রচণ্ড ঝড়ে। ডাঙা আর ডিঙা দুটোই সে ঝড়ে ছিল টলায়মান। মধুর স্মৃতিতে সে ঝড় আজও হানা দেয়। খুড়োর অকাল মৃত্যু, সেই সঙ্গে তারই হাতে মাত্র দু-দশকও গত না হওয়া খুড়তুতো ভাইয়ের প্রয়াণ তার পরিবারের সদস্যদের অকাল মৃত্যুকেই চিহ্নিত করে। বার বার তার চেতনায় এক এক করে মুদ্রিত হয় মৃত্যুকালে তার পিতামহের বয়স ছিল চল্লিশ, পিতা গত হন সাতচল্লিশে, খুড়ো পঁচিশে, খুড়তুতো ভাই প্রায় কুড়িতে। এদের স্বল্পায়ু মধুর সাঁইত্রিশ বছর বয়সের সজীব জীবনে মৃত্যুর ছায়া ফেলে। জীবনবাদী মধু পুরো উপন্যাসেই তার অনিশ্চিত বণিকজীবনে বেঁচে থাকে নানা কৌশলে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতার এ ব্যবসা যাকে কিনা মধু আখ্যা দেয়, 'এক অলিখিত অপরিণামদর্শী ব্যবসা', যা করতে গিয়ে মধুর পিতা কোনো এক জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, তীর-বেঁধা অবস্থায় দু-রাত আর দু-দিন কাটিয়ে তার নৌকা চলেছিল উজানে কামতাপুরের এক বৈদ্যের কাছে, সেই বৃত্তিকে যাপন করাটা তার জন্য রীতিমতো একটা চ্যালেঞ্জ হলেও এ টানটান উত্তেজনাকর বৃত্তিকে সে বেছে নিয়েছে নির্দ্বিধায়। পিতার কথা ভাবতে ভাবতেই মধুর চেতনাজগতে জীবন ও মৃত্যুর আলো-অন্ধকার একে অপরকে ছুঁয়ে যায়, যে কারণে সে হয়তো পিতার মৃত্যুস্থানে বার বার ফিরে গেছে:

> মদু সেই জায়গাটায় পৌঁছতে যায় যেখানে দশ সাল আগে তার পিতাকে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু খুবই মুশকিল সেই জায়গাটাকে খুঁজে পাওয়া। এমন জায়গা যেখানে নদী ফেঁপে উঠে শুধুই চর ডোবায় না, মূল খাতেরও রদবদল করে। কিংবা দাহও ঠিক নয়, সেই চরে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সেই দেহ আর অর্ধদগ্ধ দেহের মতো দেখতে কাঠ-কাঠরা ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রেখেই চলে যেতে হয়েছিল। মদু কি জানে? হরি-হরি, যা একেবারে শেষ, ছাই

> আর বাষ্প হয়ে পঞ্চভূতে মিশে গিয়েছে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৬)

*মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে জীবন-মৃত্যু-প্রেম-যৌনতা এবং বাণিজ্য পরস্পর সমান্তরাল। শুধু মধুর ব্যক্তিজীবনে নয়, উপন্যাসে লেখক যেন মৃত্যুকে নানারূপে দেখাতে চেয়েছেন। যে কারণে কখনো কখনো মৃত্যু এসেছে মিথের শরণে, গল্পচ্ছলে। মধু ফিরিঙ্গিকে শোনায় রাধাকৃষ্ণ দাসবৈরাগী রচিত কোচবিহারের আদি কাব্য *গোসানীমঙ্গল* থেকে এক ভয়ংকর মৃত্যুময় গল্প, যে মৃত্যুর ভেতরেও নিষিদ্ধ এক প্রেম-যৌনতার ঘ্রাণ ছিল। মধুর জীবনের নিষিদ্ধ প্রেম ও যৌনতার সঙ্গে সে গল্প একাকার হয়ে ওঠে। গৌড়-কুচবিহার-নিম্ন আসাম এবং বৃহত্তর রংপুর নিয়ে গঠিত কামতা রাজ্যে খেন্ বা খান বা সেন বংশের পত্তন ঘটান নীলধ্বজ। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ এবং তার পর চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর রাজা হন। নীলাম্বরের রানি বনমালাকে মন্ত্রী শশীপাত্রের যুবকপুত্র মনোহর কৃষ্ণকীর্তন পড়ে ও গেয়ে শোনাতেন। পাঠসূত্রে বনমালা ও মনোহরের ভেতর জন্মায় প্রেম এবং প্রেম থেকে তারা লিপ্ত হয় ব্যাভিচারে। মনোহর ও বনমালার অবৈধ প্রেম ও শরীরী সম্পর্ক ধরা পড়ে। বিচারে চণ্ডী-চামুণ্ডার সামনে মনোহরের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন রাজা। কামতায় তখন প্রচুর নরবলি হয়। চণ্ডীর পূজায় যথারীতি মনোহরের বলি হলো এবং চণ্ডীদেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বলির প্রসাদ রান্না করে খাওয়ানো হলো মন্ত্রী শশীপাত্রকে। অর্থাৎ, পুত্রের ব্যভিচারের শাস্তি পিতা ও পুত্র উভয়কেই পেতে হলো। নিজ পুত্রের মাংস খেতে হলো শশীপাত্রকে। ফলে, প্রতিহিংসাপরায়ণ শশীপাত্র গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে পথ দেখিয়ে কামতায় এনে সে রাজ্যে ঢোকার গোপন পথ দেখিয়ে দিলেন। এভাবেই মুসলিম রাজার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল খেন্ বা খান বা সেন বংশ।

মধুর এ গল্পে একই সঙ্গে প্রেম-যৌনতা-রক্তপাত ও ইতিহাস বলয়িত হয়ে উঠেছে। মধু তার নিজের বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের সাযুজ্য খুঁজতে গিয়ে *গোসানীমঙ্গল* থেকে তুলে এনেছে এ গল্প। তার এ জীবন আভিযাত্রিক – নিস্তরঙ্গ নয় কখনোই। এ জীবনে যে প্রেম আসে, সে প্রেমে আছে প্রতিযোগিতা, করায়ত্ত করবার তাগিদ। সে প্রেমে কখনো কখনো রক্তের দাগ লেগে যায়, যেমন মধুর প্রেমে লেগেছিল খুড়তুতো ভাইয়ের রক্তের দাগ। উপন্যাসে নারীদের রহস্যময় প্রেমের কথা এসেছে দু-একবার। সে প্রেমকে অমিয়ভূষণ হরিণ ও ঘাই হরিণীর প্রণয়-রহস্যপ্রতীকে ধারণ করতে চেয়েছেন। ঘাই হরিণী যেমন পুরুষ হরিণের হৃদয় শিকারের পাশাপাশি তাদের শরীরকেও শিকারির হাতে তুলে দেয়, মধু সাধুখাঁর বণিক জীবনেও এরকম ফ্যাটাল নায়িকার আগমন ঘটে। অমিয়ভূষণের মদু যেন বা পুরুষের নিয়তিকে মেনে নিয়েই তির্যক কণ্ঠে হেসে বলে ওঠে:

> ... হরিণীটাই আবার ডেকে উঠল। কী-এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা সে-ডাকে। মানুষের সে ডাক বোঝার কথা নয়, তবু তা যেন মানুষ-পুরুষের বুকেও কাঁপতে থাকে।... তেমন প্রেম-প্রমত্ত অবস্থায় কারোই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরিণটা গলা লম্বা করে হরিণীর মুখের

> কাছে চাটবার চেষ্টা করছে। হরিণীটাই বরং বড় আর উঁচু। হরিণটার মাত্র দু'শিং গজিয়েছে – অস্পষ্টভাবে এরকমই মনে হল। গন্না মদুর হাতে ধনুক দেয়ার সময় পেল না। টং করে এক শব্দ হল। ততক্ষণে গন্না দ্বিতীয় তীর চাপে বসিয়ে নিয়েছে, নিশানা করছে। ওদিকে প্রথম তীরের ঘায়ে হরিণটা লাফিয়ে উঠল মাটি ছেড়ে : মাটিতে পড়তে-পড়তে দ্বিতীয়টা বিঁধল মেরুদণ্ড আর পেটের মাঝে। ...হরিণীটা ধীর মন্থর গতিতে বনের ভিতর দিকে খানিকটা ঢুকে গেল। আবার যেন ডাকল সেটা।... মদু হাসল। বলল – ঘাইরা পালাতে দেয় না। তা দেবেই যদি, দল ভুলিয়ে আনা কেন? কিন্তু এমত দৃশ্য দেখিছ আরু? এমত প্রেম, এমত খেলা? অহো, এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয়। আহা, অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনর্প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ, আবার দেখিবা দিহ, আবার। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৬-২৭)

প্রসঙ্গত মনে পড়বে জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতার কথা, যেখানে তিনি লিখছেন: 'ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;/কোথাও অনেক বনে – যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই/ পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;/তাহারা পেতেছে টের,/আসিতেছে তার দিকে/... আজ এই বিস্ময়ের রাতে/তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;/... বনের আড়াল থেকে ডাকিয়াছে জ্যোৎস্নায় –/পিপাসার সান্ত্বনায় – আঘ্রাণে – আস্বাদে;/মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়;/লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সবদিকে/একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে... মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে/... কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;/সকালে-আলোয় তাকে দেখা যাবে –/পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।/মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এই সব।' (জীবনানন্দ, ১৯৯৮: ৮৫) লিবিডো বা মহাকাম আর আদিপাপ এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষা – এসব বিষয়ের পেছনে সক্রিয় থাকে গাঢ়ভাবে। এ প্রসঙ্গে উঠে আসে মধুর কামচেতনা (লিবিডো)। নারীহীন জলজীবনে খোজা ক্রীতদাস বদর বিছানায় এলে একলহমার জন্য মধুর শরীর প্রগাঢ় কামবোধে জর্জরিত হয়। লাথি দিয়ে পরমুহূর্তে তার 'টাঁশ-ধরা' মনকে সে সজাগ করে তোলে। বলার ট্যাবাকু কিংবা ওয়াইন্ পানের আহবান একলহমায় উড়িয়ে দিয়ে সে উচ্চারণ করে, 'ড্যামেট্, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২১)। নারীহীন জীবনে হরিণের মাংস আর চর্বিযুক্ত পলান্ন তার অবদমিত কামনাকে জাগ্রত করে। কামতাপুরের ত্রিশ হাত প্রাচীর ঘাই হরিণের পরিপুষ্ট পশ্চাৎদেশে রূপান্তরের বিষয়টিও মধুর অবদমিত কামনারই প্রকাশ। অমিয়ভূষণ প্রতীকী পরিচর্যায় উপন্যাসে কামাতুর মধুর যৌনতৃষ্ণাকে প্রকাশ করেন:

> শরীরে জ্বর-জ্বরই বলা যায়। অতিতর মশলাযুক্ত পলান্ন ও প্রচুর কাবাব মাংস খেয়ে মাঝরাতে তার পিপাসা পেল। উঠে জল খেল সে। আর তখন তার ঠাহর হল ওটা স্বপ্নের ব্যাপারই, এতক্ষণ যা তার চোখের সামনে ঘটছিল। নতুবা কোন ডানের মন্ত্রেই কামতাপুরের ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচীর ঘাই-হরিণীর চিকন পরিপুষ্ট পিছনটা হতে পারে না।... এই কামতায় শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক তুবরাক খাঁয়েরা, শেষে হুসেন শা আর

এখন নরনারায়ণ। কিন্তু? বরবাক বা তুবরাক মারের চোটে করতোয়া বেয়ে পালিয়েছিল,... বারো বছরের চেষ্টায় হুসেন শাহ কামতাজয়ী, কিন্তু নিজ বেটা দানিয়েলকে দিল বেঘোরে। তারপর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখো আর একে যৌবন পায়। এক না বলে দুজনা বলা ভাল। মদু, তুমি ধুবড়ির কাছে সেনাপতির ছেলে রঘুকে দেখেছ, আর এখানে ঠাহর করো – রাজার ছেলে লক্ষ্মীকে দেখবে। দুই-ই যুবক। মনে হয় না তারাও ঘাই-এর ডাক শুনেছে? (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮-২৯)

কালে কালে পুরুষকে একবার না একবার তার যৌনতার কারণে ঘাইয়ের আহবানে সাড়া দিতে হয়, যার পেছনে ব্যক্তির প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা সক্রিয় থাকে। তবে, কামনা তৃপ্ত হলে মধুর চেতনায় ঘা মারে পিতার অর্ধদগ্ধ শরীর। আধপোড়া হরিণের ছড়ানো-ছিটানো হাড়মাসের চিত্রকল্প মধুর মানসচেতনায় তার পিতার অর্ধদগ্ধ শরীরের ছবিকেই যেন মূর্ত করে তোলে। সেইসঙ্গে পুরুষের অনিশ্চিত যৌবন-জীবন যেন মৃত্যুর কাছে ক্রমে নতি স্বীকার করে। মৃত্যুর এ অমোঘ পদচিহ্ন শুধু এখানেই রচিত হয়নি, কামতারাজ্যের যে ইতিহাস আছে, সে ইতিহাসে কালে কালে অস্তিত্ববান বিভিন্ন শাসকের শুক্লধ্বজ-নীলধ্বজ-নীলাম্বর-বরবাক তুবরাক খাঁ কিংবা হুসেন শাহ অথবা নরনারায়ণের রাজসিক জীবনেও কালের অমোঘ নিয়মে বেঘোরে মৃত্যুর ডঙ্কা বেজেছে। সেনাপতির ছেলে রঘু আর রাজার ছেলে লক্ষ্মীর যৌবনে হানা দিয়েছে যে ঘাই হরিণীর ডাক, শেষ পর্যন্ত তার সমাপ্তি রক্তপাতের মধ্য দিয়েই ঘটবে বলে মনে করে মধু। উপন্যাসে এভাবেই মিথ ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়ায় রচিত হতে থাকে মধুর পরিণামবোধ। ব্যভিচারী সম্পর্ক, ক্ষমতা, ভোগ আর লোভ এবং অবৈধ প্রণয় পুরুষকে বাঁচতে দেয় না। মধু মনে করে, 'জল, তরবার, তীর দুর্মদরতি নারীর মতো পুরুষের দেহের ও আয়ুর ভাগীদার হয়' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। ইতিহাস ও মিথের মোড়কে প্রতিকূল জলজীবন আর প্রতিকূল নিয়তির বোধ এভাবেই মধুর অস্তিত্বসংকটকে গাঢ়বদ্ধ করে তোলে। তার শ্বাসরুদ্ধকর জীবনকে এঁকেছেন লেখক এভাবে:

> নদী, জল, রক্ত, পাটাতন! নাড়ি বেরিয়ে আসে টেঁটার টানে, ভল্লা গলায় বুকে, মানুষ ছিটকে পড়ে জলে। মধ্যে-মধ্যে শনাশন চলে তীর, পাখ্-বাঁধা, লোহার টুপিপরা, শ' গজী তীর, চার-ছ আঙুল বেঁধে। রাগ আর ভয়, ব্যথা আর যন্ত্রণা সমান আঁ আঁ করে। পুরুষ সেখানে জীয়ে না। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩২)

অন্যত্র:

> হয়তো এ ব্যবসা ভালো নয়। সাউকারি নয়। পাপ বলবে? তা, মদু, লোকে একে পাপ বলে বোধ হয়। একবার এ পক্ষ, অন্যবার অন্যপক্ষ, আর দু-পক্ষের মধ্যে নিজের স্বার্থ দেখা। পাপ? মানুষ যেমন বাঁচে আর যেমন তার বাঁচা উচিত – দুয়ে অনেকখানি তফাৎ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩২)

মধুর জীবনের স্বার্থপরতা তার বণিকজীবনে টিকে থাকার মূলমন্ত্র। কিন্তু এভাবেই তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। কখনো কখনো চেতনায় সারাজীবনের কৃতকর্মের হিসেব নিকেশ ভিড় করে। পাপবোধে জর্জরিত মধু ক্রুশ কাঁধে যিশু কিংবা পৃথিবীর অজস্র পাপের ঘনীভূত শলাকা বুকে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যিশুকে তার স্বার্থপরতার বিপরীত প্রান্তে অনুভব করেন। কখনো কখনো যিশুর মতো মহানুভব মানুষেরও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার অক্ষমতা তার ভেতর অসহায়ত্বের জন্ম দেয়। এই যে জীবনের অনিশ্চয়তা ও অসহায়ত্ব, সমালোচক মনে করেন সেটি নারীর তুলনায় পুরুষের জন্য অধিকতর সত্য:

> মধু কথিত এই গোসানিমারী আখ্যানের নির্যাসটি যেন রূপক। নারী ছলনাময়ী হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু শুধু পুরুষের – এই তত্ত্ব গোসানিমারীর কাহিনি আর ঘাই হরিণীর কাহিনি – উভয়ই সত্য। ফলে দুইয়ে মিলেই রূপকটির নির্মাণ। আবার এখানে এ-ও irony যে, সেই ঘাইহরিণীর প্রেমাভিনয় দেখবার জন্যই মধু ঋক্-মন্ত্রোচ্চারণ করে পুনরায় চক্ষু প্রার্থনা করে... এতদসত্ত্বেও মধু'র কাছে নারী শেষ পর্যন্ত ছলনাময়ী ছাড়া কিছু নয়। তাই ঘাই হরিণীর ডাকে সাড়া দেওয়া সেই নিহত হরিণের কথা ভাবে মধু– "পুরুষ হওয়ার ফল, তেমন করে চরের বালিতে দেহের দগ্ধাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে থাকা? (মিতঋক, ২০১৮: ১৬৬)

মধু এবং তার পূর্বসূরিদের জীবনের ইতিও ঘটেছে এভাবেই – জল-তরবারি-তীর আর অতিতর রতিপ্রিয় রমণীসংসর্গে। (সোহানা, ২০২০: ৩০৮)

উপন্যাসে সতীদাহ প্রথার একটি দৃশ্যকল্প এঁকেছেন অমিয়ভূষণ। ফিরিঙ্গি রালফ্ ফিচ্ মধুর দেশের সতীদাহ দেখে তার দেশের 'উইচ হান্টিং' রিচুয়ালের কথা মনে করে তাকে একাকার করে তুলতে চাইলে স্বয়ং মধু তাতে বাধ সাধে, 'তা আংলিশ – পো এক দেশেতে যি হয় প্রথা অন্য দেশেতে সি কৌতুক। আবার একই ব্যাপার উভয়েতে ভিন্ন নামে ঘটে। আমার দেশে স্ত্রীলোক পুড়ে সতী, তোমরার দেশেতে ডান।' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৮) এখানে মধুকথিত সতী শব্দের সঙ্গে পবিত্রতার যোগসূত্র তৈরি করতে চাইলেও এই আসন্নমৃতা সতীর যে রূপকল্প অমিয়ভূষণ এঁকেছেন, বা যে রূপ মধু দেখেছে, সেটি ভীষণ। সেই ভীষণতা রূপায়ণের দৃশ্য বর্ণনায় লেখক যে শব্দকল্প নির্মাণ করেন, তার প্রতিটি শব্দে ভয়ানক রসের বিস্তার ঘটেছে। এ ভয়ানক রস মৃত্যুর রূপকল্প নির্মাণে অনুকূল:

> দু-দশ পা গিয়ে মদু দলসমেত থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন বেজে উঠল, জগঝম্প, রামশিঙা আর ঢাক। সতীকে এনেছে, এনে ফেলেছে, তেলে-সিঁদুরে-কান্নায়-ভয়ে আচ্ছন্ন ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত রোগীর মতো বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক যুবতী। আর আত্মানম্ জ্যুহোমি সো আ হা, হা হা হা আঁ আঁ আঁ আঁ। আঁ-আঁ করছে আগুন, আর আগুন আকাশ বাতাস একসঙ্গে ডুকরে-ফুকরে হাহাকার করে উঠল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৪)

মৃত্যুর এই চিত্রকল্পে মধু দু-হাতের মুঠি বন্ধ করে পায়ের আঙুলে মাটি আঁকড়ে ফ্যাকাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ বর্ণনায় আসন্নমৃতা নারীর বেদনা আকাশ বাতাসের ডুকরে-ফুকরে ওঠার ভেতর প্রকাশমান। তবু এ মৃত্যু কিছুটা হলেও সুনিশ্চিত, পুরুষের ক্ষীণ আয়ুর মতো অনিশ্চিত নয়। তাই সে বলে ওঠে, 'আমাদের দেশেতে স্ত্রীজাতি অতিতর বৃদ্ধি পায়া আছে, কেননা ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কলমধরা কায়েৎ, আরু মাটিমাখা চাষা ছাড়া কোন পুরুষই বা দীর্ঘকাল জীয়ে? জল, তরবার, তীর দুর্মদরতি নারীর মত পুরুষের দেহের ও আয়ুর ভাগীদার হয়।' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫) মধুর দেশের সতীদাহের এই ধর্মসংস্কার ফিরিঙ্গির মানসপটে জাগিয়ে তোলে তার দেশ বা বিশ্বের ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন সব মৃত্যুমুখ। জেসুইট মিশনারিদের বধের মাচায় তোলা, তাদের চার টুকরো শরীর আর নাড়িভুঁড়ি, ইউনিট্যারিয়ানদের খোঁটায় বেঁধে জীয়ন্ত ঝলসানো, পিউরিট্যানদের ফাঁসি সবই ধর্মের কারণে হয়। এসব মৃত্যু নিষ্ঠুর ও বেদনাতুর। তবে, ধর্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে উপন্যাসে রালফ্ ফিচ্ যিশুর কথা তুলে আনেন মধুর সঙ্গে পাপপুণ্য নিয়ে কথোপকথনে। ফিচ ও মধুর আলাপচারিতায় যিশুর কষ্টসহিষ্ণুতাসূত্রে তাঁর পুনর্জন্মের কথাও সন্তর্পণে যুক্ত হয়ে যায়:

> এটা কিন্তু ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে পনেরোশো ছিয়াশি বছর আগে মানুষের পাপের জন্য সকলের হয়ে ঈশ্বরের এক অবতার কী কষ্টই সহ্য করেছিল! মৃত্যুর অধিক সে কী শারীরিক আর মানসিক কষ্ট! অবতার হলেও দেহধারী, আর সেজন্য কষ্টও হবে। লোহার কালো-কালো খিল হাতে-পায়ে-বুকে আর মাথায় বিঁধছে, যেন পৃথিবীর অজস্র পাপ ঘন হয়ে-হয়ে সেই খিল হয়ে বিঁধছে। এর আগেও ভাবতে গিয়ে মদু যেন সেই বেদনার কিছু অনুভব করছে। তেমন কালো তীক্ষ্ণ কিছু যেন তার বুকেও বেঁধে। আর তা থেকে তেমন রক্ত ঝরে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৩)

অমিয়ভূষণের সাহিত্যে জেসাস বা যিশু খ্রিস্টের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ আছে। তাঁর আত্মবিসর্জন, মমত্ববোধ, মানবিকতা প্রতিনিয়ত অমিয়ভূষণকে যিশুর প্রতি অনুরক্ত করেছে। *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসেও এর প্রকাশ লক্ষ করা যাবে, যখন তিনি ফিরিঙ্গির কাছে স্বীকার করে নেন:

> পাপ কি লোহর খিল? যা হয়ে ফিরিঙ্গির দেশের এক অবতারের বিঁধেছিল বটে। যেমন ধরো, ফিরিঙ্গি কাকে আদিপাপ বলে। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৯)

অমিয়ভূষণের *বিলাস বিনয় বন্দনা* (প্রপ্র. ১৩৮৩) উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে এসে পাঠক যিশুর প্রতি লেখকের প্রবল আবেগ টের পান। উপন্যাসটিতে পুরনো আপেল গাছটিকে বাঁচাতে গিয়ে বিনয় তার চারপাশের ফাটল বোজাতে যাবার পথে যে ভার বহন করেছে সেটি ক্রুশ-কাঁধে যিশুর মিথকেই মনে করিয়ে দেয়। অমিয়ভূষণ লিখেছেন:

> এখানে বোধ হয় বেশি খাড়া হয়েছে পথ। বিনয়কে আর একটু চলতে হচ্ছে। তার ফলে এরকম মনে হয়, যেন কাঁধের ভারটাই বাড়ছে। কাঁধের উপরে সেই মই। কারো কারো কি মনে হবে এমন একজনের কথা যিনি একটা ক্রসের ভারে নুয়ে নুয়ে চলেছিলেন। তা বোধ হয় উচিত হয় না। কেননা তিনি তো নিজের ব্যথা বহন করেননি। বহুর, পৃথিবীর সব মানুষের যন্ত্রণা... আর তিনি আপেল বাঁচাতেও যাননি। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ১৬৯ )

এখানে অমিয়ভূষণ মজুমদার পুরো পৃথিবীর পাপের ধারক হিসেবে যিশু খ্রিস্টের মহানুভবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে, আপেল শব্দ প্রতীকায়িত করেছে আদম ইভ মিথানুষঙ্গ। আদম-ইভের মতো মধুর কৃত পাপ তার ভোগস্পৃহাজাত এবং এটি তার জীবনতৃষ্ণার নামান্তর। আদম-ইভ অনুষঙ্গী আপেল বা আপেল গাছ পুরাণে পাপের প্রতীক হলেও এইসব উপন্যাসে সেটি জীবনতৃষ্ণার প্রতীক, নতুনকে জানার প্রতীক। তবে আদম কিংবা জেসাস ক্রাইস্টকে এ উপন্যাসে লেখক এখানে যুক্ত করে প্রকারান্তরে যেন এমন কথাই বলতে চান যে মানুষের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ জেসাস আর হবাকে ছুঁয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় আদিপিতা আদমও কিন্তু জীয়ে না শেষপর্যন্ত। মৃত্যুর স্বাদ তাদের পেতেই হয়।

১৯৮৭ সনের জানুয়ারিতে বীরেন্দ্র চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে মধু সম্পর্কে আলাদা করে কিছু কথা লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ, যেখানে মধুর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে:

> মদুর 'পরমাথ্থ' 'ধম্ম' এসব বিষয়ে ঝোঁক ছিল।... ওদিকে মদু... সাতিশয় হারামজাদা অর্থাৎ না-পাকের চাইতে না-পাক, অর্থাৎ non-believer to the power n= son of a bitch-র মতো হালকা ব্যবহার নয়। ইদানীং তার সঙ্গী এক মুসলমান যার utility নিষ্পাপ বোধহয়, এক ইংলিশ ভ্রমণকারী (যারা শুধু দেশ দেখার জন্য দেশ দেখে কি?) যে জিসাস, ক্রুসিফিকেশন নিয়ে ইত্যাদি নিয়ে, ডাইনি পোড়ানো নিয়ে গল্প করে, যে সম্ভবত পিউরিটান্ত না হোক্ প্রোটেস্টেন্ট। দেখা যাচ্ছে মধু 'লাউসি' শব্দটা উচ্চারণ না করলেও লাউস কাকে বলে জানে। ড্যাম্ কথাটা জানে। বলে, ড্যামেট, বোথ। নো উইমেন, ইউ সি।' কাজেই মধু কি করে বা একদম পেগান থেকে যায় ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে!... মদুর মধ্যে একটা self contradiction জন্মানোর সুযোগ থেকে গিয়েছে। তাহলেও সে শেষপর্যন্ত ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে (পান্দর শো আট শককে বিস্মৃত না হয়ে) পেগান থেকে যায়। যেজন্য সে সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি নয়... (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪৪৪-৪৪৫)।

অমিয়ভূষণের এ বক্তব্যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দেও মধু পেগান, সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি নয়। এবং সে সীমাহীন অবিশ্বাসী; অমিয়ভূষণের কথায় 'সাতিশয় হারামজাদা'। অমিয়ভূষণ মনে করেন, মধুর পেগান ধর্মবোধের ওপর উটকো কিছু সেমেটিক বোধ ঢুকে গেছে। আর তাই পেগানিজম আর সেমেটিজমের মিথস্ক্রিয়ায় তার ধর্মবোধে স্ববিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে। কাজেই ব্রাহ্মণ তোপদার তার রান্না করলেও মুসলমান বদর আর ফিরিঙ্গি বলার সাথে পানাহার সংক্রান্ত ছোঁয়াচে তার

বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এদিকে কপালে রসকলি আঁকে, অর্থাৎ বৈষ্ণব সহজিয়া মতকে লালন করে, অন্যদিকে কালিমায়ের পুতি বাক্যের ইমেজে শাক্তধর্মও এর সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই মধুর ধর্মবিশ্বাস পাঠকের চেতনায় এক মিশ্র বোধের জন্ম দেয়। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে চাইলে রালফ্ ফিচ্‌কে সে বলে, 'ধর্মেতে সেঁদিয়ো না, বাপা, ও বড়ি গাড়্ডা। আমরা সমাজ থেকে ঝেঁটিয়ে দিই, মোর গে যা বলি' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৫)। আবার প্রেমপ্রমত্ত ঘাই আর হরিণ দেখে তার পুনর্জন্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুগ্ধ নয়নে ভাবে, 'এমত দৃশ্য দেখিছ আরু? এমত প্রেম, এমত খেলা? অহো, এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয়। আহা অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ প্রনর্প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। হে প্রাণনেতা, আবার প্রাণ দিহ, আবার চক্ষু দিহ, আবার দেখিবা দিহ, আবার' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ২৭)। এই যে প্যাগানিজম, হিন্দু ধর্মভাবনা, এই যে মধুর একইসাথে সংস্কারময় ও সংস্কারহীন এক উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল মনোভাব, সেটি তার ধর্মবোধকে স্ববিরোধী করে তোলে। মূলত জীবন টিকিয়ে রাখবার নিমিত্তে যেকোন পন্থা অবলম্বনে সে সকল সংস্কারের ঊর্ধ্বে। শুধু তাই নয়, সে বহুজাতিক সংস্কৃতির ধারক। মধু মনোজাগতিক টানাপড়েন কিংবা অস্তিত্বসংকট উত্তরণে ধর্ম আঁকড়ে ধরেনি। বরং তাকে নিয়তিবাদী বলা যেতে পারে, যার পেছনের ইতিহাসটুকু ক্রূর, জটিল। পাঠক উপলব্ধি করেন, উপন্যাসে মধুর বংশপরম্পরাগত স্বল্পায়ুসংকটজাত নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রগাঢ় পাপবোধের নেতিবাচকতা, জল ও বাণিজ্যজীবনের অনিশ্চয়তা কিংবা প্রতিমুহূর্তের বিপন্নতা তার ব্যক্তিত্বের রচয়িতা। যদিও মধু বহুজাতিক সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে সর্বসত্তায়, তবু কখনো কখনো ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ন্যূনতা প্রমাণে রালফ্ ফিচ্ সচেষ্ট হলে মধু তার নিরাপত্তাহীনতা উত্তরণে নিজের শেকড়কেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। যদিও মধু ষোড়শ শতকের চরিত্র, বিশ শতকে জন্মালে তার এই শেকড় অন্বেষণের বিষয়টিকে বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেত। বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলোকেই নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলা হয়। দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা ঔপনিবেশিক চক্রান্তের একটি প্রক্রিয়ার নাম। যাকে নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো সাংস্কৃতিক বোমা আখ্যা দিয়েছেন:

> এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের প্রতিবেশ, নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্য, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি খোদ নিজের উপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়া। নিজেদের অতীতকে অর্জনহীন এক পোড়োভূমি বলে পরিচয় করাতে চায় এবং মানুষের মধ্যে নিজভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা লাভের স্পৃহা তৈরি করার প্রয়াসে থাকে এই সাংস্কৃতিক বোমা। (নগুগি, ২০১০: ১৫)

বিশ শতকের এ তত্ত্ব ষোড়শ শতকের মধুর ওপর আরোপ করা না গেলেও মধু যে শেষ পর্যন্ত নিজের শেকড়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, মৃত্যু বিষয়ক ভাবনাতেও সে বিষয়টি

মূর্ত হয়ে ওঠে। অন্য দেশে যেখানে মৃত্যুর বিভীষিকা ও নিষ্ঠুরতা মধুর চেতনায় প্রকট হয়ে ধরা পড়ে, সেখানে ভারতবর্ষের মৃত্যু-সংস্কার অনেক বেশি সারপুষ্ট বলেই মধুর মনে হয়। ভারতভূমে মধু ধর্মের জন্য যে বলির কথা বলেছেন, সেটি 'মৃত্যুতেই সব কিছুর বিনষ্টি' – এমন নিষ্ফল ভাবনাকে কাটিয়ে সারবান জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। কিংবা সে মনে করে, 'আমরা সেই মাটি থেকেই উঠি না বাণ শিবের মত, যেখানে খাসি বধ্য।' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪১) এভাবেই মধু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফুরিয়ে যাবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া স্বীকার করে নিয়েই মৃত্যুর পরও এ সারবান স্বদেশ ও স্বজাতির ভেতরেই তার প্রাণবীজ রোপণের স্বপ্ন লালন করে। কাজেই জলজীবনের অনিশ্চয়তায় মৃত্যু হলেও এ জীবনেই ফেরার স্বপ্ন দেখে সে এবং মৃত্যুতে দেহের বিনষ্টি ঘটলেও আকাঙ্ক্ষা করে উত্তরসূরির রক্তবীজে বেঁচে থাকবার। যেহেতু মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু জীবনের তৃষ্ণাও অমোঘ, মানুষ তাই দৈহিক মৃত্যু হলেও আত্মিকভাবে তার কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। পাপ-পুণ্য-প্রথা কিংবা সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। তাই দেশ-কাল-পাত্রভেদে এ আকাঙ্ক্ষায় মধু যেমন তাড়িত, তেমনি উপন্যাসে রালফ ফিচ ফিরিঙ্গিও এর ঊর্ধ্বে নয়। ফিরিঙ্গির সেই আকাঙ্ক্ষা মধুর কাছে উন্মোচিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গির মৃত্যুভীতি একাকার হয়ে ওঠে মধুর মৃত্যুভীতির সঙ্গে:

ক. এখানে ফিরিঙ্গি নামবে।... ছোট একটা মোট তার। ঝোলাই বলো। নিজেই কোঠা থেকে বয়ে আনল। কিংবা আরো সঠিক বলতে হলে অন্য হাতে এক পুলিন্দা। মদুর সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঝোলাটা পাটাতনে রেখে দু-হাতে পুলিন্দাটা এগিয়ে ধরল।
বলল – এগুলো রাখো।
– কী এ?
– এক খুঁতি টোব্যাকুর বীজ।
হাতে নিয়ে মদু বলল – এটা, এ তোমার হাতে লেখা দেখি।
একটু থামল ফিরিঙ্গি। পরে বলল – আর যদি ফেরা না-হয় আমাদের দেশের কোনো মানুষ পাও দিহ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৬)

খ. আর মৃত্যুভয়ও আছে। নতুবা পাণ্ডুলিপি গচ্ছিত করা কেন? ট্যাবাকুর বীজ না হয় বন্ধুত্ব। কিন্তু পাণ্ডুলিপি? যদি না-ফিরি, আর একজনের হাতে দিয়ো। অকারণ নয়। ঠিকই বলেছ, কখন কী হয় বলা যায় না। কী হয় রোজ লিখে? না, যা দেখো তা লিখ।... আর ওদিকে মরার ভয়ও আছে। যা দেখেছ তা কাগজে লিখে রাখলে। কিন্তু একবার বুজলে তো আর চোখ হবে না। হ্যাঁ, তা নয়। মানে তোমার দেখা কাগজে লেখা থাকল আবছা অস্পষ্ট। তোমার পরেও তোমার চোখ থেকে গেল। মদু হাসল: এও ধরো, বলাই, তাই হল, পুনরস্মাসু চক্ষুই হল না? আবার চক্ষু দিহ। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৩৭-৩৮)

ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে এদেশেই আবার পুনর্জন্ম চান মধু। মূলত উত্তরসূরির ভেতর তিনি নিজের কর্ম-বীজ উপ্ত করে তাদের অভিজ্ঞানের সঙ্গে নিজের যাপিত অভিজ্ঞান মেলাতে চান। এভাবেই ভাবনাজগতে তার নিজের আকাঙ্ক্ষা ফিরিঙ্গির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এক হয়ে ওঠে:

> ফিরিঙ্গি রোজনামচাখানা দিয়ে গেছে। মদু হাসবে যেন, এমন মনে হল। একি হয় যে তুমি আবার চক্ষু দিহ বলবে না অথচ তোমার চোখের দৃষ্টি কাগজে লিখে রাখলে, চোখ বুজলেও যা থেকে যাবে।... আহা, আবার চক্ষু দিহ। কারণ, হে ঈশ্বর, তোমার এই পৃথিবীতে অতিতর রতিপ্রিয়া রমণীর স্বামী যেমত আমরা জীয়ী না।... অবশ্য তোমার এক পুতি আছে, মদু।... পুতির বিয়ে দিয়েছে, বেটাবউও সুলক্ষণা। ফুলের মতো মেয়ে... আর যদি না-ই ফেরে সে, তাদের মধ্যে কি বীজ বেঁচে থাকে না? বটের বীজ কত ছোট।... আর ভগবান, ভগবান, যদি মত হয়, ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে এদেশেতেই যেন জন্মাই যদি তেমন-কিছু ঘটে যায়। (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪০-৪১)

অমিয়ভূষণের জীবনস্মৃতি পাঠ করলেও দেখা যায়, এই লেখকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিলীন হবার ভয় ছিল। এণাক্ষী মজুমদার (২০১৭: ৪৩৩) বলছেন, 'বাবার ফুরিয়ে যাবার ভয় ছিল খুব। আর তাইতে তাঁর এতগুলি সন্তান; এতগুলি চোখ, এতগুলি মন, এতগুলি অস্তিত্ব – অমিয়ভূষণের মৃত্যু হলেও তাঁরা থাকে, তাদের মধ্যে অমিয়ভূষণ থাকেন।' এণাক্ষী মজুমদারের এ বক্তব্য কি মধুর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> মানুষ কেন লেখে? রবিঠাকুরের কথায় বলি, 'তুমি কি কেবলই ছবি।' এখানে একটা অদ্ভুত ভয় কাজ করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে রবিঠাকুরের শেষদিন পর্যন্ত অনেক কবিতা, গানে ওই ভয়কে তুলে ধরেছেন। তিনি কিন্তু তখন আর মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন না। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই, কেননা আমি সর্বস্বান্ত হইনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একে একে প্রিয়জনের মৃত্যু তাঁকে মৃত্যুভয়-রহিত করে তুলছিল। আমি বলি, আমার মৃত্যু নেই। চাঁদবেনে তে চাঁদ বলছে, আমার মৃত্যু নেই। কেন বলছে? না, শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা 'আমি/'আমার' বলি। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর মৃত্যু কার হবে? শরীরের। 'সোল'-এর তো মৃত্যু নেই। চাঁদের ফিলজফি, আমারও ফিলজফি। (অমিয়ভূষণ, ২০১৮: ১৭৯)

চাঁদ-মধু কিংবা অমিয়ভূষণ শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে একই দর্শনের সূতোয় গাঁথা মানবসত্তা। বণিক পেশার অনিশ্চিতিতে এ যেন মধুর অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার এক নির্দ্বিধ উপায়। জীবন-এষণা আর অনিশ্চিত মৃত্যুর অমোঘ সহাবস্থান মধুর জীবনের নিবিড়তম আখ্যান। উপন্যাসে সে আখ্যানের অংশ হয়ে ওঠে ফিরিঙ্গি রালফ্ ফিচ্ থেকে শুরু করে সতীদাহের আসন্ন মৃত্যু আলিঙ্গনরত সতী পর্যন্ত। সংস্কৃতিগত ব্যবধান সত্ত্বেও জীবন-এষণা ও অমোচনীয় মৃত্যুর অস্তিত্বের অনুভব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে করে তোলে অভিন্ন।

*মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসে বণিক মধুর জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ উঠে এলেও এর ভেতরেই অমিয়ভূষণ মজুমদার গুঁজে দিয়েছেন তার পেশা-জীবন টিকিয়ে রাখবার কৌশল-ধর্মবোধ-জীবনচেতনা-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান-রাজনৈতিক অভীপ্সা। এর সাথে জড়িয়ে গেছে ইতিহাস-ঐতিহ্য, পুরাণ ও লেখকের জীবনাভিজ্ঞান। তবে, এসব কিছু ছাপিয়ে যেটি এই উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, সেটি ব্যক্তির জীবনতৃষ্ণা এবং অনিশ্চিত মৃত্যুভয়। নানা চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তিনি বীভৎস রস ব্যবহার করে মৃত্যুর ভয়াল রূপের পাশাপাশি বেঁচে থাকবার সৌন্দর্যকেও প্রস্ফুটিত করেছেন। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে মধুর প্রবল টিকে থাকবার ইচ্ছাপোষণের মধ্য দিয়ে। জীবনের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সেই অনিশ্চিত জীবন যাপন করবার এবং টিকে থাকবার কৌশল জীবনের প্রতি মধুর একান্ত আবেগের প্রকাশ। জীবনের পাশাপাশি মৃত্যু এ উপন্যাসের শরীরে নানাভাবে নিজের রূপকল্প নির্মাণ করেছে ঘাই হরিণীর ছলনায় আক্রান্ত পুরুষ হরিণ, সতীদাহের সতী, পূজোর নানা অনুষঙ্গে, কামতাপুর রাজাদের অন্তর্ঘাতী ইতিহাসের কাহিনিতে কিংবা পুরাণের প্রতীকী প্রকাশে। প্রতিটি মৃত্যুর রূপকল্পে মধু সাধুখাঁ নিজের মৃত্যুকে যুক্ত করে নিয়েছেন। জীবন-মৃত্যুর দোলচলে মধু সাধুখাঁ আচ্ছন্ন এক প্রাণ। অমিয়ভূষণ সেই প্রাণের ভেতর চিরকাল বেঁচে থাকবার আরও গভীর এক ইচ্ছাস্বপ্নকে মুদ্রিত করে এ চরিত্রকে উপন্যাসে এক নশ্বর মানুষ হিসেবেই রূপায়িত করেছেন। অমিয়ভূষণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মধুকে 'হারামজাদা কি সাধে বলেছি? বলে আবার প্রাণ দিহ, আবার দেখিবা দিহ – এত সত্ত্বেও নিজের পৌত্র অথবা প্রপৌত্র হয়ে এই নদীর দেশেতেই জন্মাতে চায়। নিলাজ নদী, নিলাজ সময় নিলাজ মানুষ' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪৪৪)। মধুকে তার এ অন্তহীন জীবনতৃষ্ণাই বাঁচিয়ে রাখে, যদিও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার অনিশ্চয়তা কাটে না তাতে। কেননা মধু জানে, রাত শেষে যে ভোরের অপেক্ষায় সে কাল কাটায়, সেই ভোরে 'কী রকম আলো ফুটবে কে জানে?' (অমিয়ভূষণ, ২০০৭: ৪১)। মধুর এ বেঁচে থাকবার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা এবং অনিশ্চয়তাই *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের প্রাণ।

## সহায়কপঞ্জি


অমিতা চ্যাটার্জী, ২০১৮। 'প্রসঙ্গ: জীবন-এষণা, (এরস), মরণ-এষণা (থ্যানাটস) ও যুদ্ধ', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড: এবং মুশায়েরা*, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৭। *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০১৮। এণাক্ষী মজুমদার সম্পাদিত *কথা বলতে বলতে: অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

এণাক্ষী মজুমদার (২০১৭)। *বনেচর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জীবনানন্দ দাশ, ১৯৯৮। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র: জীবনানন্দ দাশ*, অবসর, ঢাকা।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো, ২০১০। *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড*, দুলাল আল মনসুর অনূদিত, সংবেদ, ঢাকা।

মিতঋক বর্মা, ২০১৮। 'মধু সাধুখাঁ উপন্যাসের রূপকল্প ও তত্ত্ব', *এবং মুশায়েরা* (অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশেষ সংখ্যা), চতুর্বিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা।

সোহানা মাহবুব, ২০২০। *অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস: সময়চেতনা ও অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

**সাক্ষাৎকার:**

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ১৯৯৫। 'উত্তরাধিকার', পঞ্চম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, অমিয়ভূষণ মজুমদার সংযোজন সংখ্যা, অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৭। 'কথা বলতে বলতে', *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র* চতুর্থ খণ্ড, (গ্রন্থণা: অপূর্বজ্যোতি মজুমদার ও এণাক্ষী মজুমদার), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।